নিয়ন্ত্রণ
Controlling

৮

ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হলো সর্বশেষ পদক্ষেপ। ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলির মধ্যে প্রথমটি হলো পরিকল্পন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এরপর সংগঠিতকরণ ও নেতৃত্বদানের পর সবশেষে নিয়ন্ত্রণ। একটি প্রতিষ্ঠানের মানব-সম্পদ, আর্থিক সম্পদ, কায়িক সম্পদ ও তথ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা চক্র নিয়ন্ত্রণ কার্যের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। নিয়ন্ত্রেণের মূল উদ্দেশ্য হলো পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা পরিকল্পনার সাথে প্রকৃত কার্যসম্পাদনের তুলনা করা, যাতে পরিকল্পনাকে সঠিক রাস্তায় রাখার জন্য প্রয়োজনে প্রতিবিধানমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যসমূহ পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা হয় এবং কোনোরূপ ব্যতিক্রম বা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনের সাথে নিয়ন্ত্রনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এ ইউনিটটি পড়ার সময় 'পরিকল্পন' ইউনিটের সাথে মিল রেখে পড়লে বোঝতে সুবিধা হবে। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যবস্থাপক এবং কর্মীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে আমরা এ ইউনিটে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১: ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ
পাঠ - ৮.২: নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ
পাঠ - ৮.৩: নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ
পাঠ - ৮.৪: নিয়ন্ত্রণের কৌশল

পাঠ ৮.১ ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ
Effective Controlling

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিয়ন্ত্রণ কী তা বলতে পারবেন।
- নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকীয় উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

জীবনের প্রতিটি কার্যেই নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। আমরা যে সব সময়ই লিখিতভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পন্ন করি, তা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামাজিক জীবনে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে অলিখিতভাবেই নিয়ন্ত্রণ-কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেখানে পরিকল্পনা মাফিক কোনো কর্মসম্পাদন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় সেখানে 'নিয়ন্ত্রণ' থাকা আবশ্যক। নতুবা পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, তা বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এমনকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ত্রুটিবিচ্যুতি হচ্ছে কিনা তাও জানা সম্ভব হয় না। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন কালে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা বা ত্রুটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য নিয়ন্ত্রণ কার্য চালু রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই এজন্য ব্যবসায়িক জগতে নিয়ন্ত্রণ-এর বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এ পাঠে আমরা ব্যবস্থাপকের প্রয়োজনকে সামনে রেখে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব।

নিয়ন্ত্রণ কী
What is controlling

ব্যবস্থাপনার চারটি প্রধান কার্যাবলির শেষ কার্য হলো নিয়ন্ত্রণ। প্রাতিষ্ঠানিক জগতে নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মসম্পাদনের পরিমাপণ ও ত্রুটি সংশোধনকরণকে বোঝানো হয়। **হেইঞ্জ ওয়েরিচ ও হ্যারল্ড কুঞ্জ** (Heinz Weihrich and Harold Koontz)- এর ভাষায়: The managerial function of controlling is the measurement and correction of performance in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are being accomplished.[১] নিয়ন্ত্রণকে লক্ষ্যার্জনের জন্য পরিচালিত সাংগঠনিক কার্যাবলির মনিটরিং ও সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বস্তুতপক্ষে নিয়ন্ত্রণের বেলায় দেখা হয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কি না এবং পরিকল্পনায় নির্ধারিত মান অনুসারে কাজকর্ম চলছে কি না। কোনো প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়লে তার কারণ চিহ্নিত করার পর যথোপযুক্ত প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পন ও নিয়ন্ত্রণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এ দুটোকে আলাদা করা যায় না। তবে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণকে আলাদাভাবে দেখাই সংগত। আসলে এ দুটো ব্যবস্থাপকীয় কার্য একটি কাঁচির দুটি ব্লেডের মতো। দুটি ব্লেড না থাকলে কাঁচি দিয়ে কোনো কাজ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি পরিকল্পন না থাকলে নিয়ন্ত্রণও মূল্যহীন। কারণ পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ডের বিপরীতেই কর্মসম্পাদনের পরিমাপ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে নিম্নতম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক পর্যন্ত সবাই কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠানের কোনো না কোনো কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরেই নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

[১] Weirich, H. and Koontz, H (2018). Management: A global perspective, 12th Int. edition, McGraw Hil Inc. Page21.

পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ

Requirements for adequate control

একটি আদর্শ বা কার্যকরী (effective) নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো উপাদান রয়েছে। একটি নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমকে কার্যকরী করতে হলে এ উপাদানগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। H. Koontz একটি আদর্শ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো আবশ্যকীয় উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

(১) পরিকল্পনা ও পদের সাথে সংগতি রেখে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে (Control should be tailored to plans and positions): সকল নিয়ন্ত্রণ কৌশল ও পদ্ধতি পরিকল্পনাকে অনুসরণ করবে এবং এগুলোর মধ্যে পরিকল্পনা প্রতিবিম্বিত হবে। প্রত্যেক পরিকল্পনা ও প্রত্যেক কার্যের কতকগুলো অনুপম (unique) বৈশিষ্ট্য আছে। পরিকল্পনা ও কার্যের এরূপ বৈশিষ্ট্য থাকায় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যভেদে ভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- উৎপাদন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। একইভাবে নিয়ন্ত্রণ পদের (positions) দিকেও ধাবিত হবে। অর্থাৎ কোন পদে কোন ধরনের কার্য-দায়িত্ব আছে তার সাথে সংগতিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণ সংগঠন প্যাটার্ন বা সংগঠন কাঠামোর প্রতিফলন ঘটাবে।

(২) নিয়ন্ত্রণ বোধগম্য হতে হবে (Controls should be understandable): প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যবস্থাপকদের নিকট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য বা বোধগম্য হতে হবে। এসব ব্যক্তিবর্গের নিকট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বোধগম্য না হলে নিয়ন্ত্রণ সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সহজ, সরল, বোধগম্য ও কার্যকরী হলে ব্যবস্থাপকগণ তা ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে ফলপ্রসূ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলো সনাক্ত করতে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে সক্ষম হতে হবে (Controls should point out execptions at critical points): নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে করে তা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলোকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। যেখানে ব্যবস্থাপকদের বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার সেখানে বিরাজমান সমস্যাবলি সনাক্ত করতে সক্ষম হলে ধরে নেওয়া যায় যে, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি খুবই কার্যকর হয়েছে।

(৪) নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক হবে (Controls should be objective): আদর্শ নিয়ন্ত্রণের আরেকটি উপাদান হলো উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিকতা। ব্যবস্থাপনার কতকগুলো উদ্দেশ্য থাকে। এ উদ্দেশ্যগুলো যথোপযুক্তভাবে অর্জনের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ হবে বাস্তবধর্মী। উদ্দেশ্যমুখী মান সংখ্যাভিত্তিক হতে পারে। প্রতি ইউনিট পরিব্যয়, প্রতি ইউনিট শ্রম-ঘণ্টা ইত্যাদি সংখ্যাভিত্তিক উদ্দেশ্য মানের উদাহরণ। এরূপ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কার্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(৫) নিয়ন্ত্রণ নমনীয় হবে (Controls should be flesible): আদর্শ নিয়ন্ত্রণের অন্য একটি শর্ত হলো নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ হবে নমনীয়। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনমনীয় হলে প্রকৃত কার্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। যেমন, প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্য চলাকালীন বিভিন্ন রকম বিপদআপদ হতে পারে বা মেশিন নষ্ট হতে পারে। এতে করে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এজন্য বিনির্দিষ্ট মান অর্জনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নমনীয় হওয়া উচিত। অতএব প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের পরিবর্তন হলে নতুন পরিকল্পনা মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ কার্য সমাধা করতে হবে।

(৬) নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সাংগঠনিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (The control system should fit the organizational climate): আদর্শ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আরেকটি উপাদান হলো সাংগঠনিক পরিবেশের সাথে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সামঞ্জস্য। যেমন, একটি কঠোর নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমে (a tight control system) যদি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এতে করে নিয়ন্ত্রণ কার্য সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে। সুতরাং সাংগঠনিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

(৭) নিয়ন্ত্রণ হবে মিতব্যয়িতাপূর্ণ (Controls should be economical): আদর্শ নিয়ন্ত্রণের আরেকটি উপাদান হলো স্বল্প ব্যয়সাধ্য নিয়ন্ত্রণ। যে পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা থেকে প্রাপ্ত সুবিধার চেয়ে তার ব্যয় কম হতে হবে। একটি ছোটো কোম্পানি যদি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যয়বহুল নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে তবে তা ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত

ক্ষতিকর হবে। তাই যে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানের আকার, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে উপযুক্ত (suitable) সেটাই ব্যবহার করা উচিত।

(৮) নিয়ন্ত্রণ সংশোধনীমূলক হবে (Controls should lead to corrective action): সফল নিয়ন্ত্রণের অন্য একটি পূর্বশর্ত হলো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা থাকা। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিনির্দিষ্ট কার্যমান এবং পরিকল্পনার সাথে প্রকৃত কার্যের তুলনা করে ত্রুটিবিচ্যুতি সনাক্ত করা হয়। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে সনাক্তকৃত ঐ সব ত্রুটিবিচ্যুতি বা দুর্বলতা সংশোধনের ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

উপরোল্লিখিত উপাদানগুলো বিবেচনাপূর্বক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অনুশীলন করা উচিত। একটি আদর্শ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উপরোক্ত উপাদানগুলো অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথায় তা কার্যকর প্রমাণিত হবে না।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনার চারটি প্রধান কার্যাবলির শেষ কার্য হলো নিয়ন্ত্রণ। প্রাতিষ্ঠানিক জগতে নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মসম্পাদনের পরিমাপণ ও ত্রুটি সংশোধনকরণকে বোঝানো হয়। একটি আদর্শ বা কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো উপাদান রয়েছে। যেমন- পরিকল্পনা ও পদের সাথে সংগতি রেখে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, বোধগম্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলো সনাক্ত করতে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে সক্ষম করা, নিয়ন্ত্রণকে উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক করা, নমনীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সাংগঠনিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, নিয়ন্ত্রণকে মিতব্যয়িতাপূর্ণ করা এবং সংশোধনীমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করা।

পাঠ ৮.২ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ
Steps in Controlling

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি নিয়ন্ত্রণ কী এবং পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকীয় উপাদানগুলো সম্পর্কে। ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অত্যাবশ্যক। নিয়ন্ত্রণ একটি প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়াটি একজন ব্যবস্থাপক সম্পাদন করতে পারেন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এ পাঠে আমরা নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় জড়িত পদক্ষেপসমূহ
Steps involved in controlling process

যে প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বলা হয়। এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বলতে কতকগুলো ধাপের লাগাতার অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। W. H. Newman নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপের কথা বলেছেন। যেমন- স্ট্র্যাটেজিক বিন্দুতে মান নির্ধারণ, কার্যফলের ওপর পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রদান এবং যথাযথ সংশোধনের পন্থা অবলম্বন। অন্যদিকে Robert J. Mockler নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার চারটি ধাপের কথা বলেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় মূলত ৪টি পদক্ষেপ জড়িত। আমরা এখানে পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি। পদক্ষেপগুলো চিত্র ৮.২- এ প্রদর্শিত হয়েছে।

১. মান নির্ধারণ (Setting standards): নিয়ন্ত্রণ কার্যের প্রথম পদক্ষেপ হলো বিনির্দিষ্ট মান (standard) প্রতিষ্ঠা। প্রণীত পরিকল্পনা যদি বিশদ ও জটিলতাপূর্ণ হয়, তাহলে ব্যবস্থাপকগণকে এর প্রতিটি দিকে খেয়াল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। এ অবস্থায় পরিকল্পনার আলোকেই নির্দিষ্ট মান (specific standard) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ মান হলো পুরো পরিকল্পনার কতগুলো নির্ধারিত বিন্দু, যার দ্বারা ব্যবস্থাপক পরিকল্পনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন হচ্ছে কি না পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রকম মান প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট নিম্নোক্ত মান নির্ধারণ করতে পারে:

ক. রেস্টুরেন্টে ঢোকার ১০ মিনিটের মধ্যে গ্রাহকদের খাবার পরিবেশন করা হবে।
খ. যেসব গ্রাহক খাবার নিয়ে যেতে চাইবে তাদেরকে ৮ মিনিটের মধ্যে প্যাকেট সরবরাহ করা হবে।
গ. গ্রাহক টেবিল ত্যাগ করার পর এক মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার করা হবে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রত্যেকটি মান সুনির্দিষ্ট ও সময় দিয়ে বেঁধে দেওয়া। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে মান নির্ধারণ করা হয়।

২. মানের বিপরীতে কার্যফল পরিমাপ (Measuring performance against standards): নিয়ন্ত্রণের এ পদক্ষেপ বিনির্দিষ্ট মানের বিপক্ষে প্রকৃত কার্যফল নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পরিকল্পনা মোতাবেক কতটুকু কার্যসম্পাদিত হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়। এ পরিমাপের জন্য আদর্শ পদ্ধতি হলো ভবিষ্যত দর্শন (forward looking) পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকগণ অগ্রসর হলে কার্যচ্যুতি ঘটার পূর্বেই তা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

৩. মানের সাথে কর্মসম্পাদনের তুলনাকরণ (Comparing performance against standards): মান প্রতিষ্ঠা ও কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত নির্দেশকগুলো (performance indicators) পরিমাপ করার পর ব্যবস্থাপক এ দুটোর মধ্যে তুলনা করে দেখেন। এরূপ তুলনাকরণের কাজ খুব সহজ না। কোনো কোনো মান সংখ্যাত্মকভাবে প্রকাশ করা খুবই কঠিন। যেমন- 'গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি'-এরূপ মান মূল্যায়ন করা যথেষ্ট কঠিন।

৪. বিনির্দিষ্ট মান ও পরিকল্পনার বিচ্যুতি সংশোধন (Correcting variations from standards and plans): নিয়ন্ত্রণের শেষ ধাপ বা পদক্ষেপ হলো বিনির্দিষ্ট মান ও পরিকল্পনার বিচ্যুতি শোধরানো। বিনির্দিষ্ট মান ও প্রকৃত কার্যের মধ্যে বিচ্যুতি নির্ধারণের পরই এ পদক্ষেপের কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অতিরিক্ত স্টাফ নিয়োগ, অধস্তনদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বা বরখাস্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কাঁচামালের সরবরাহের কোনো দুর্বলতা আছে কি না, উৎপাদনে গাফিলতি আছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলোও সনাক্ত করে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

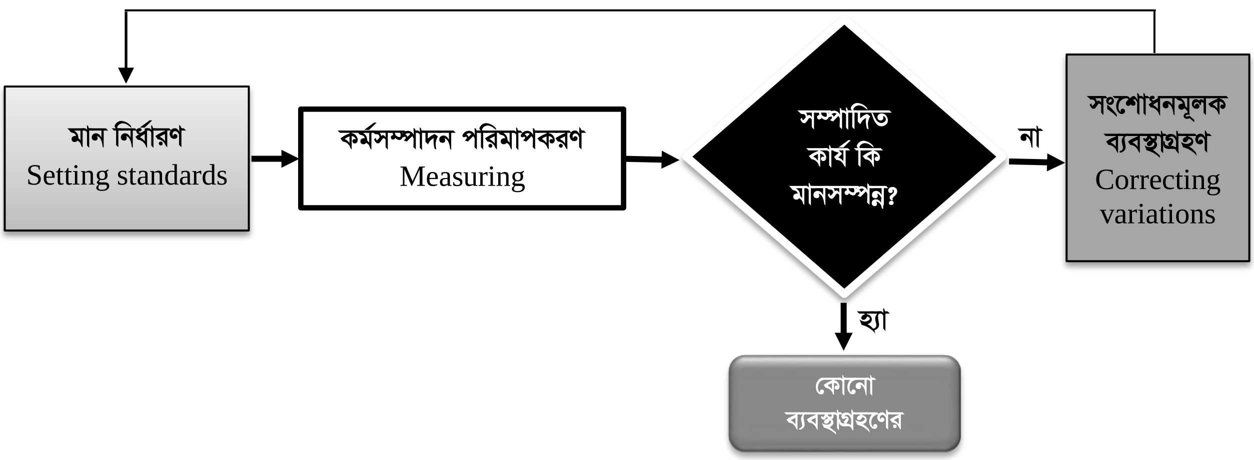

চিত্র ৮.১: নিয়ন্ত্রণের মৌলিক পদক্ষেপসমূহ

নিউপোর্ট ও ট্রি ওয়াথা মনে করেন, নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের মাঝে আরেকটি ধাপ থাকা প্রয়োজন। ধাপটির নাম তাঁরা 'বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আদর্শ মানের সাথে সম্পাদিত কার্যফলের কোনো বিচ্যুতি বা পার্থক্য দেখা গেলে এ পর্যায়ে সঠিকভাবে তা নিরূপণ করা হয় এবং তা যথাযথ বিশ্লেষণ করে বিচ্যুতির কারণ নির্ধারণ করা হয়। পরে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কারণ নির্ধারণ অপরিহার্য বিষয়। বহু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় এ ধাপটি সন্নিবেশিত করে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত করে থাকেন।

আমরা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে জানলাম। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ সম্পর্কে। পরের পাঠে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ কার্যসম্পাদন করা হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় মূলত ৪টি পদক্ষেপ জড়িত। নিয়ন্ত্রণ কার্যের প্রথম পদক্ষেপ হলো বিনির্দিষ্ট মান প্রতিষ্ঠা। নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো বিনির্দিষ্ট মানের বিপক্ষে প্রকৃত কার্যফল নিরূপণ করা। মান প্রতিষ্ঠা ও কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত নির্দেশকগুলো পরিমাপ করার পর ব্যবস্থাপক এ দুটোর মধ্যে তুলনা করে দেখেন। নিয়ন্ত্রণের শেষ ধাপ বা পদক্ষেপ হলো বিনির্দিষ্ট মান ও পরিকল্পনার বিচ্যুতি শোধরানো।

পাঠ ৮.৩ নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ
Types of Control

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের জন্য সকল ব্যবস্থাপকই উপযুক্ত টুলস্- এর খোঁজে থাকে। এ টুলস্গুলো সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপকরা সাধারণত তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণ টুলস্ ব্যবহার করে থাকে- ফিডফরওয়ার্ড (Feedforward), সমবর্তী (Concurrent) এবং ফলাবর্তন (Feedback) টুলস্। কোনো কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারেন, কাজটি যখন সংগঠিত হচ্ছে, অর্থাৎ কাজটি যখন শুরু হয়েছে তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে পারেন, আবার কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োগকৃত প্রথম টুলস্কে বলা হয় ফিডফরওয়ার্ড, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সমবর্তী এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ফলাবর্তন টুলস্ (চিত্র ৮.২ লক্ষ করুন)। এ টুলস্গুলোকে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রকার বলে থাকেন। আমরা অত্র গ্রন্থে এগুলোকে টুলস্ হিসেবে আখ্যায়িত করার পাশাপাশি চার ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। আসুন, জেনে নেই বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে।

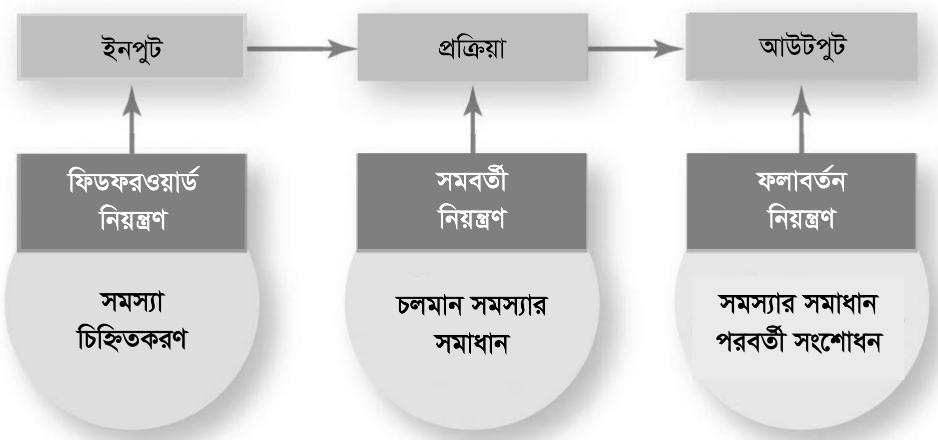

চিত্র ৮.২: নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার তিন ধরনের টুলস্

নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ
Types of control

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ দেখতে পাওয়া যায়। সবগুলো নিয়ন্ত্রণকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

১. কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ
২. কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ
৩. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ
৪. আর্থিক নিয়ন্ত্রণ

আসুন এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেই।

⊙ কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ (Structural control): প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করছে, তা পর্যবেক্ষণের জন্য কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ-এর দুটি উপশ্রেণি রয়েছে: (ক) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, (খ) ক্ল্যান নিয়ন্ত্রণ।

<u>(ক) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Bureaucratic control):</u> আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হলো কর্মীদের আনুগত্য নিশ্চিত করা। যে প্রতিষ্ঠান এরূপ নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করে সে প্রতিষ্ঠান কঠোর নিয়মকানুন ও অনমনীয় কাঠামোরা ওপর নির্ভরশীল থাকে, প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত ধারার ভেতরে থেকে কাজ করার জন্য কর্মীদের তাগিদ দেয় এবং উল্লম্ব কাঠামো (tall structure) পছন্দ করে। ব্যক্তির সাফল্যের সাথে সংগতি রেখে পুরস্কার বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কর্মীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না।

<u>(খ) ক্ল্যান নিয়ন্ত্রণ (Clan control):</u> অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা 'ক্ল্যান নিয়ন্ত্রণ' নামে পরিচিত। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি বাড়ানো। এরূপ ব্যবস্থা দলীয় আদর্শ ও কর্পোরেট কালচারের ওপর নির্ভরশীল। এমনভাবে ব্যবস্থা রাখা হয় যেন কর্মীরা নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদেরকে উৎসাহিত করা হয়।

⊙ কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ (Strategic control): যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৌশল প্রণয়নের পর সে কৌশল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হাসিলের জন্য কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে কৌশলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে দেখা দরকার। এটি করার জন্য প্রতিষ্ঠানের কৌশল ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সমন্বিত করা অত্যাবশ্যক। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এরূপ সমন্বিতকরণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এগুলো হলো: (ক) সাংগঠনিক কাঠামো, (খ) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব, (গ) উৎপাদন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, (ঘ) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীবাহিনী বা মানব সম্পদ এবং (ঙ) তথ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেখা হয়, বাস্তবায়িত কৌশল কতটুকু পরিমাণে প্রতিষ্ঠানের কৌশলিক অভিলক্ষ্য (strategic goals) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যদি দেখা যায় যে, সাংগঠনিক কাঠামো বা নেতৃত্ব বা অন্য কোনো প্রকারের উপরোল্লিখিত উপাদান লক্ষ্যার্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, তখন সে উপাদানের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ ক্ষেত্রে হয়তো কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে, ব্যবস্থাপক বা নেতা বদল করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী মনে হতে পারে, মানব সম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে কিংবা তথ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করার দরকার হতে পারে।

⊙ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production control): পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পদকে পণ্য বা সেবায় রূপান্তর করার জন্য যেসব প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, তার সাথে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে তিন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। এগুলো হলো: (ক) প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ (Preliminary Control), (খ) বাছাই নিয়ন্ত্রণ (Screening Control) ও (গ) উৎপাদন-উত্তর নিয়ন্ত্রণ (Postaction Control)। প্রতিষ্ঠান যেসব আর্থিক, কায়িক, মানবিক ও তথ্য সংক্রান্ত সম্পদ সংগ্রহ করে সেগুলো প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের আগেই এগুলোর কোয়ালিটি বা পরিমাণ যাচাই করে দেখা হয় এবং মনিটর করা হয়। এরূপ নিয়ন্ত্রণকে বলা হয় ***প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ***। উদাহরণস্বরূপ, পেপসি-কোলা কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে এ কোম্পানি প্রার্থীদেরকে পূর্ণ নিয়োগদানের আগেই বিভিন্ন পরীক্ষা বা সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা যাচাই করে নেয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানে ঢোকার আগেই মানব সম্পদের কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পক্ষান্তরে, ***বাছাই নিয়ন্ত্রণ*** উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালে পণ্যের কোয়ালিটি বা পরিমাণ সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড বা মান নিশ্চিত করার সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার ওপর বাছাই নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। পণ্যের কোয়ালিটিও এরূপ নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের তুলনায় এটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। রূপান্তর প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর চূড়ান্ত পণ্যের কোয়ালিটি বিনির্দিষ্ট মানের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য প্রবর্তন করা হয় ***উৎপাদন-উত্তর নিয়ন্ত্রণ***। পণ্য তৈরির পর এরূপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিরীক্ষণ করা হয়।

⊙ **আর্থিক নিয়ন্ত্রণ (Financial control):** আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করে বা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে আনা হয় (যেমন পণ্য বিক্রয়ের টাকা, শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগকৃত টাকা)। আবার কিছু আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠান নিজের দখলে রাখে (যেমন চলতি মূলধন, রিজার্ভ তহবিল)। কিছু আর্থিক সম্পদ আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে চলে যায় (যেমন, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য প্রদেয় অর্থ)। ব্যবস্থাপকদেরকে অবশ্যই এসব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যাতে খরচ সংকুলানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আয় নিশ্চিত করা যায় এবং মুনাফাও অর্জণ করা সম্ভব হয়। আর্থিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলো হলো: বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ (আর্থিক বার্জেট, অপারেটিং বাজেট ও অনার্থিক বাজেট ইত্যাদির মাধ্যমে); আর্থিক বিবরণী (যেমন ব্যালেন্স শিট, আয়-বিবরণ); অনুপাত বিশ্লেষণ (যথা- তারল্য অনুপাত, দেনা অনুপাত, মুনাফা অনুপাত, অপারেটিং অনুপাত); আর্থিক নিরীক্ষা (বাহ্যিক নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা) ইত্যাদি।

আমরা জানলাম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে। একজন ব্যবস্থাপককে জানতে হবে নিয়ন্ত্রণে কী পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করতে পারেন। পরের পাঠ আমরা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপকরা সাধারণত তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণ টুলস্ ব্যবহার করে থাকে- ফিডফরওয়ার্ড, সমবর্তী এবং ফলাবর্তন টুলস্। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ দেখতে পাওয়া যায়। সবগুলো নিয়ন্ত্রণকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়: কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ, কৌশল নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ। কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এগুলো হলো: (ক) সাংগঠনিক কাঠামো, (খ) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব, (গ) উৎপাদন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, (ঘ) প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীবাহিনী বা মানব সম্পদ, এবং (ঙ) তথ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেখা হয়, বাস্তবায়িত কৌশল কতটুকু পরিমাণে প্রতিষ্ঠানের কৌশলিক অভিলক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পদকে পণ্য বা সেবায় রূপান্তর করার জন্য যেসব প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, তার সাথে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে তিন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়। এগুলো হলো: (ক) প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ, (খ) বাছাই নিয়ন্ত্রণ ও (গ) উৎপাদন-উত্তর নিয়ন্ত্রণ। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করে বা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে আনা হয়। আবার কিছু আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠান নিজের দখলে রাখে। কিছু আর্থিক সম্পদ আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে চলে যায়। ব্যবস্থাপকদেরকে অবশ্যই এসব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যাতে খরচ সংকুলানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আয় নিশ্চিত করা যায় এবং মুনাফাও অর্জণ করা সম্ভব হয়।

পাঠ ৮.৪ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Controlling

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ধরনের কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যবস্থাপক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যের মতোই জটিল একটি প্রক্রিয়া, যার সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করতে পারে সঠিক কৌশল। নিয়ন্ত্রণের এ কৌশলগুলোকে অনেকে পদ্ধতিও বলে থাকে। এ কৌশলগুলোকে ইংরেজিতে strategy না বলে technique বলাই উত্তম। এ পাঠে আমরা নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি
Different methods of controlling

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো বৃহৎ উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে:

১. বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কৌশল
২. সনাতনী অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল
৩. টাইম-ইভেন্ট নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ
৪. প্রোগ্রাম বাজেটিং
৫. কর্মপ্রণালি পরিকল্পনা ও বিবরণ
৬. তথ্য প্রযুক্তি
৭. তথ্য অনুশীলনে কমপিউটারের ব্যবহার

আসুন এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

১. বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ
Budgetary Control

ব্যবস্থাপকীয় নিয়ন্ত্রণের একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল বা পদ্ধতি হলো বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ। এটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা গেলে নিয়ন্ত্রণ সফল হবার সম্ভাবনা সমধিক। নিয়ন্ত্রণ কার্যসম্পাদনের জন্য বাজেটিং হলো একটি উল্লেখ্যযোগ্য কৌশল। এখন প্রশ্ন হলো, বাজেট কী এবং বাজেটারি নিয়ন্ত্রণইবা কী? বাজেট বলতে পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে বোঝায়। অর্থাৎ পরিকল্পনাকে যখন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বাজেট বলা হয় (A budget is a numerical expression of plan) আর বাজেটের সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করাকে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। বাজেটের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী করা হবে বা কী উদ্দেশ্য অর্জন করা হবে তা সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়।

সাধারণ অর্থে, বাজেটের সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার কার্যসম্পাদন নিয়ন্ত্রণ করাকে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ বলে। প্রতিষ্ঠানের কার্য সূচারুপে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যিক বাজেট (functional budget) প্রস্তুত করা হয়। এসব

বাজেট হচ্ছে ঐসব ভবিষ্যত লক্ষ্যের বিবরণ যা সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব বাজেট তৈরি করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে কার্যাবলিও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেট আদর্শমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন প্রকারের বাজেট

Different types of budget

বিভিন্ন ধরনের বাজেটের মাধ্যমে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করা হয়। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে সাধারণত চার প্রকারের বাজেটের বহুল প্রচলন দেখা যায়:

(১) আয় ও ব্যয় বাজেট (Revenue and expense budgets): যে বাজেটে প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ও মোট ব্যয়কে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয় তাকে আয় ও ব্যয় বাজেট বলে। এরূপ বাজেটে প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ও মোট ব্যয়কে সংখ্যাত্মকভাবে প্রকাশ করা হয়। বাজেটে নির্দেশিত আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় হচ্ছে কি না, তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। খাতওয়ারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে অসংগতি দেখা দিলে ব্যবস্থাপনা সেখানে হস্তক্ষেপ করে এবং কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ-সীমায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়।

(২) সময়, স্থান, সামগ্রী এবং পণ্য বাজেট (Time, space, material and product dudget): এ ধরনের বাজেট পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে উপকারী। এসব বাজেট প্রথমত টাকায় প্রকাশ না করে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। যেমন প্রত্যক্ষ শ্রম-ঘণ্টা বাজেট, মেশিন-ঘণ্টা বাজেট, উপাদানের একক (units of material) বাজেট ইত্যাদি। অধিকাংশ ফার্ম পণ্যের আউটপুট (output) বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। আবার অধিকাংশ উৎপাদন বিভাগ চূড়ান্ত পণ্যের উপাদানসমূহের আউটপুটের অংশের জন্যও (share of the output of components of the final products) বাজেট করে থাকে। এভাবে বাজেট করা হলে তা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

(৩) মূলধনী ব্যয় বাজেট (Capital expenditure budgets): মূলধনী ব্যয় বলতে কারখানা, যন্ত্রপাতি, মজুত মাল এবং অন্যান্য মূলধনী আইটেমের ব্যয়কে বোঝায়। এরূপ বাজেট মূলধনী ব্যয়ের লক্ষ্য অর্জনে অত্যাবশ্যকীয়। মূলধনী সম্পদে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মূলধনী ব্যয় বাজেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

(৪) নগদ বাজেট (Cash budget): আরেক ধরনের বাজেট হলো নগদ বাজেট। যে বাজেটে নগদ প্রাপ্য (cash receipts) এবং নগদ প্রদেয় (disbursements) দেখানো হয় তাকে নগদ বাজেট বলা হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল। নগদ টাকার লেনদেন নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে নগদ বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

এ ছাড়াও বাজেট পরিবর্তনশীল ধরনের হতে পারে কিংবা শূন্যভিত্তিক হতে পারে:

⇒ **পরিবর্তনশীল বাজেট (Variable budget)**: বাজেটে যেহেতু কতকগুলো অসুবিধা বিরাজমান সেহেতু এসব অসুবিধা অতিক্রমণের জন্য পরিবর্তনশীল বা নমনীয় (flexible) বাজেট প্রণয়ন আবশ্যক। এটি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা আনয়নে এবং গতিশীলতা সৃষ্টিতে সাহয্য করে থাকে। পরিবর্তনশীল বাজেট বিভিন্ন খাতের ব্যয়ের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে করা হয়; যার দ্বারা নির্ধারণ করা হয় কীভাবে একক ব্যয় আউটপুটের সাথে পরিবর্তিত হয়। কিছু কিছু ব্যয় আউটপুটের পরিমাণ দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। যেমন-অবচয়, খাজনা ও বিমা, প্লান্ট ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, স্থায়ী মূলধনের সুদ, প্রশাসনিক ব্যয় ইত্যাদি। এগুলো মোট পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট হারে ব্যয় হতে থাকে। আবার এমন সব ব্যয় আছে যা আউটপুটের মোট পরিমাণের ব্যয়, বিদ্যুতের জন্য ব্যয়, জ্বালানি ব্যয় বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়, বিক্রয় কর ইত্যাদি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ। বাজেটে পরিবর্তনশীলতা বা নমনীয়তা সম্পূরক মাসিক বাজেটে (supplementary monthly budget) অর্জন করা যেতে পারে। এতে পূর্বানুমানের ভিত্তিতে মাসিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি ৬ মাস বা এক বছরের জন্য কোম্পানির বাজেট প্রণীত হয়ে থাকে।

⇒ **শূন্যভিত্তিক বাজেটিং (Zero-base budgeting):** পরিবর্তনশীল বাজেটের আরেকটি ধরন হলো শূন্যভিত্তিক বাজেটিং। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামসমূহকে কতকগুলো প্যাকেজে (packages) ভাগ করা হয়, যাতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য ও সম্পদের সম্পৃক্তকরণ করা সম্ভব হয়। তারপর ভিত্তি থেকে প্রত্যেক প্যাকেজের ব্যয়

নির্ধারণ সম্ভব হয়। শূন্যকে ভিত্তি (zero base) ধরে প্রত্যেক প্যাকেজের বাজেট শুরু করে প্রত্যেক বাজেট-সময়ের ব্যয় স্বচ্ছভাবে নির্ধারণ করা হয়। এভাবে বাজেট প্রণয়নে গতানুগতিক প্রবাহ পরিহার করে পূর্ববর্তী সময়ের (period) থেকে কী পরিবর্তন হয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়।

এ কৌশল সাধারণত প্রকৃত উৎপাদন এরিয়ায় প্রয়োগ না করে তথাকথিত সমর্থন এরিয়ায় (so called support area) প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, অধিকাংশ প্রোগ্রামের জন্যই ব্যয় করার কতকগুলো ইচ্ছাধীনতা (discretion) থাকে। যেমন-মার্কেটিং গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মী পরিকল্পনা ও অর্থ সংস্থান প্রোগ্রাম। এ ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠানের জন্য ঈপ্সিত মনে করে ব্যয়ের ভিত্তিতে মুনাফা মূল্যায়ন করা হয় এবং ঈপ্সিত মুনাফার পরিমাণের মাত্রা অনুসারে সাজানো হয়। তারপর যে প্যাকেজ থেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা যায় সেটি নির্বাচন করা হয়। এ কৌশলের প্রধান সুবিধা হলো, এটি ব্যবস্থাপককে প্রত্যেক প্রোগ্রামের স্বচ্ছ পরিকল্পনা প্রণয়নে শক্তি যোগায়। ব্যবস্থাপকগণ এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রামের ব্যয় ও নতুন প্রোগ্রামের ব্যয় মূল্যায়নের তুলনামূলক সুযোগ পায়।

ফলপ্রদ বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ
Effective budgetary control

ফলপ্রদ বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কতকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভরশীল । বাজেট প্রণয়নে যথার্থতার ওপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল। যথার্থ ব্যক্তি কর্তৃক যথাসময়ে, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য, নমনীয় বাজেট প্রণয়ন করা হলে এটি উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়। কার্যকর বাজেটের জন্য নিম্নোক্ত দিকগুলোর উপস্থিতি আবশ্যক। যেমন-

- **উচ্চ ব্যবস্থাপনার সমর্থন:** বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হওয়ার প্রথম শর্ত হলো তাতে উচ্চ ব্যবস্থাপনার সমর্থন থাকতে হবে। উচ্চ ব্যবস্থাপনার সমর্থন না থাকলে সে বাজেটের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না।কারণ উচ্চ ব্যবস্থাপনাই নিম্নস্তরের লোকজনের সাহায্যে বাজেট বাস্তবায়ন করে থাকেন। সুতরাং উচ্চ ব্যবস্থাপনার সমর্থন বাজেটারি নিয়ন্ত্রেণের সফলতার একটি অন্যতম শর্ত।
- **অংশগ্রহণ:** বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের সফলতার অন্য একটি শর্ত হলো কর্মীদের বাজেট পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ। যদি কর্মীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তাহলে তা বাস্তবায়নে তারা উৎসাহ অনুভব করে। কারণ তারা জানে বাজেট তাদের হাতেই তৈরি। এভাবে কার্যিক স্তরে বাজেট গৃহীত হলে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ও সহজ হয়ে থাকে।
- **মান সম্পন্নতা:** বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের সফলতার অন্য একটি উপাদান হলো বাজেটের মান। অর্থাৎ বাজেটে সুনির্দিষ্ট মান থাকতে হবে। অনেক বাজেট সুনির্দিষ্ট মানের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মান নির্ধারিত না থাকলে অনেক ব্যবস্থাপক তাদের অধস্তনদের নিকট থেকে বাজেটের প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং প্রস্তাবিত ও গৃহীত বাজেট অবশ্যই মান সম্পন্ন হতে হবে। অন্যথায় বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতার শিকার হতে পারে।
- **তথ্য:** বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের সফলতার অন্য আরেকটি উপাদান হলো তথ্য। বাজেটারি কার্য চলাকালীন ব্যবস্থাপকের জন্য সহজলভ্য তথ্য আবশ্যক। প্রকৃত ও অনুমানকৃত কার্যফল সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তথ্য প্রবাহ অপরিহার্য। যথার্থ তথ্য ও তথ্য প্রবাহের ব্যবস্থা থাকলে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
- **বাজেটকে পরিকল্পনার পূর্ণ মর্যাদা প্রদান:** বাজেটকে শুধুমাত্র ভবিষ্যত অনুমান হিসেবে না ধরে একে এমন একটি লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে যাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যত কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। নিয়ন্ত্রণের সার্বিক স্বার্থে বাজেটকে সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গণ্য করা বাঞ্ছণীয়।
- **দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করণ:** বাজেট প্রণয়ন করার জন্য দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বাজেট কোন কর্মকর্তা প্রণয়ন করবে, তা সুনির্দিষ্ট করা না থাকলে বাজেট প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।
- **সমন্বয়ের মাধ্যম:** বাজেট প্রণয়নের সময় সমন্বয় সাধনের ব্যাপারটি বিবেচনা করতে হবে। তাই যখন এক বিভাগের বাজেট প্রণয়ন করা হয়, তখন অন্য বিভাগের বাজেটগুলোও বিবেচনা করা উচিত। তাহলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সৃষ্টি হবে।
- **অগ্রগতি অনুসরণ:** বাজেটের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে অনুসরণ করা হলে বাজেটের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বাজেটের অগ্রগতি জানার জন্য কর্মসম্পাদনের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- **সময়সীমা নির্ধারণ:** বাজেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়। বাজেটের সময়কাল প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রতিষ্ঠান যে ধরনেরই হোক না কেন, পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বাজেটের সময়কালে নির্ধারিত করতে হবে।
- **নমনীয়তা:** বাজেট সর্বদাই পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তনযোগ্য হওয়া উচিত। সাধারণত বিকল্প বাজেট প্রণয়ন, পরিবর্তনশীল বাজেট প্রণয়ন, স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং এবং নিয়মিত বাজেট পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজেটকে নমনীয় করা যায়।
- **সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা:** বাজেটের সাফল্য কর্মীদের আগ্রহের ওপর নির্ভর করে বিধায় এটি প্রণয়ন করার সময় এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে এটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। বাজেট সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাজেটে বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

সনাতনী অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল
Traditional Non-budgetary Control Techniques

অনেকগুলো অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল আছে যেগুলো বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো চার প্রকার হতে পারে। যেমন-

(১) পরিসংখ্যান উপাত্ত (Statistical data): অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলের একটি হলো পরিসংখ্যানিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ। যদি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত উপাত্ত পাওয়া যায় তাহলে এর দ্বারা পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে বিচারবিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- বিক্রয় বা ব্যয় শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পেল বা কত ভাগ হ্রাস পেল তা জানার জন্য পরিসংখ্যানের আশ্রয় নিতে হবে। অধিকন্তু পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হলে কোনো বিষয়ের ধারা (trend) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া পরিসংখ্যানিক চার্টের মাধ্যমে এক নজরে পুরো বিষয়টি অবগত হওয়া যায়। এ কারণে বিশ্লেষণ কৌশল হিসেবে পরিসংখ্যানিক তথ্য উপাত্তের ব্যবহারের ওপর বাস্তবে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(২) বিশেষ রিপোর্ট এবং বিশ্লেষণ (Special report and analysis): অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণের অন্য একটি কৌশল হলো বিশেষ রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ। এটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ভালো গুণসম্পন্ন রুটিন মোতাবেক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে এটি ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেমের (Management information Systems-MIS) প্রভূত উন্নয়ন ঘটায়। কোনো জটিল কার্যের ক্ষেত্রে সফল ব্যবস্থাপক অনেক সময় কার্য বিশেষজ্ঞ (operations analyst) নিয়োগ করে থাকেন। এতে করে বিশেষ পরিস্থিতিতে বা বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট পাওয়া যায়। এতে করে ব্যবস্থাপক সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কার্য নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হন।

(৩) কার্যিক অডিট (The operational audit): অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণের আরেকটি কৌশল হলো কার্যিক অডিটের ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্বাধীন ও নিয়মিতভাবে কর্মমূল্যায়ন করে থাকে। এ কাজটি কোনো স্টাফ বা অভ্যন্তরীণ অডিটর সম্পাদন করে থাকে। ব্যবসায়ের হিসাব, অর্থ সংস্থান ও অন্যান্য কার্যে এরূপ অডিট অনুসরণ করা হয়।

(৪) ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ (Personal observation): ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাকার্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যদিও বাজেট, চার্ট, রিপোর্ট, অনুপাত, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি কৌশলগুলো নিয়ন্ত্রণে অনুসরণ করা হয়। তথাপি ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করার পরও ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ এ কারণে দরকার যে, এটা সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবনের একমাত্র উপায়। এটি ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করা হয় বিধায় একে ''চাক্ষুষ পরিদর্শনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা'' যাকে ইংরেজিতে Management by Walking Around বলা হয়।

টাইম ইভেন্ট নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ
Time Event Network Analysis

অন্য একটি পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল হলো সময়-ঘটনা নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ কৌশল। এ কৌশল উন্নয়নের পূর্বে সময় ও ঘটনার আবহমান পরিবর্তনের কারণে প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ যৌথভাবে কাজ করে কিনা তা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ কৌশলের মাধ্যমে প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ কীভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পর আন্তঃনির্ভরশীল তা মূল্যায়ন করা হয়। সময়-ঘটনা নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণে সাধারণত তিন ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হয়:

১. **গ্যান্ট চার্ট (Gantt chart):** Henry L. Gantt নামক একজন ব্যবস্থাপনা বিশারদ সময় ও ঘটনা নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের একটি চার্ট তৈরি করেছেন। তাঁর নামানুসারে এটি গ্যান্ট চার্ট নামে পরিচিত। এ চার্ট উৎপাদন প্রোগ্রামের সময় ও ঘটনার মধ্যকার সম্পর্ক দেখায়। একে বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থাপনার বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলে ধারণা করা হয়। এ চার্টের মাধ্যমে উৎপাদন প্রোগ্রামের সময় ও কাজের বর্ণনা থাকে। এটি সঠিক সময়ে পরিকল্পনা মোতাবেক সঠিক কার্যসম্পাদনে কার্য নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। তাই কার্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গ্যান্ট চার্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

২. **মাইলস্টোন বাজেটিং (Milestone budgeting):** সময়, ঘটনা বা কাজ নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের অন্য একটি কৌশল হলো মাইলস্টোন বাজেটিং। গ্যান্ট চার্টের চেয়ে উন্নত মানের আধুনিক কৌশল হলো মাইল স্টোন বাজেটিং। অনেক প্রজেক্ট ও কার্যের ক্ষেত্রে এ কৌশল অধুনা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৌশল ও উন্নয়নমূলক প্রজেক্টকে ভেঙ্গে কতকগুলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে বিভক্ত করা হয়। তারপর এ অংশগুলোকে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে অনুসরণ করা হয়। এখানে মাইলস্টোন বা মাইলপোস্ট (milepost) বলতে নির্দিষ্ট কার্যাংশকে বোঝানো হয়েছে। একটি বৃহৎ প্রজেক্ট কয়েকটি সাহায্যকারী পরিকল্পনা বা সাব-প্রজেক্ট নিয়ে গঠিত হয়। এ পদ্ধতিতে মাইলস্টোনকে সনাক্তকরণযোগ্য বিভাগ (identifiable segments) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যখন কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের (segment) কার্যসম্পাদিত হয় তখন অন্যান্য অংশের ব্যয় (cost)-ও সহজে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩. **পার্ট (PERT):** এটির পূর্ণরূপ হলো (Program Evaluation and Review Technique)। অর্থাৎ এটি হলো কার্যপ্রণালি মূল্যায়ন ও পরীক্ষা কৌশল। এটি মূলত, গ্যান্ট চার্টেরই একটি উন্নত প্রকাশ। এ কৌশলটি ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর বিশেষ প্রজেক্ট অফিস উদ্ভাবন করে। এ পদ্ধতি সর্বপ্রথম পোলারাইজড অস্ত্র পদ্ধতির (polarized weapon system) পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রজেক্টের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনের সময় তা ব্যয় এবং পন্থা নির্দেশ করা হয়। পার্ট (PERT) চিত্র কতকগুলো বৃত্ত নিয়ে গঠিত। এ বৃত্তগুলো দ্বারা নির্দিষ্ট কার্যাংশকে বোঝায় যা একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হয়। এতে তিন ধরনের সময় অনুমান থাকে। যেমন- ইতিবাচক (optimistic), অধিক গ্রহণীয় এবং নেতিবাচক (passimistic)। এ ধরনের সময়ের গড় করে একক (unit) সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তারপর সংকটপূর্ণ পথ (critical path) নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে কোনো কাজে সর্বাধিক সময় ব্যয় হবে তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এভাবে কার্যাংশের সময় ও ব্যয়ের সনাক্তকরণ ও মূল্যায়নের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কার্য সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রোগ্রাম বাজেটিং
Program Budgeting

একটি বহুল ব্যবহৃত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল (tools) হলো প্রোগ্রাম বাজেটিং। এটি প্রাথমিকভাবে সরকারি কার্যে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এ পদ্ধতি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই ব্যবহারযোগ্য। এটিকে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও বাজেটিং (PPB) বলে। এ ধরনের বাজেটের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সম্পদের ধারাবাহিক বণ্টন নিশ্চিত করা হয়। এতে প্রোগ্রাম এবং তার লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর দ্বারা বাজেটের সাধারণ দুর্বলতাগুলো অতিক্রম সম্ভব হয়। এতে মুনাফার বিপক্ষে পরিব্যয়ের বিষয়টি ইপ্সিত কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সুতরাং প্রোগ্রাম বাজেটিং-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সম্পদাদির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং বিনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের

পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। বৃহৎ উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রোগ্রাম বাজেটিং অনেক সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তথ্য প্রযুক্তি
Information Techology

নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল বা উপায় হলো তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। ব্যবস্থাপনার সিস্টেম মডেল প্রকাশ করে যে, ব্যবস্থাপকীয় কার্য চালিয়ে যাওয়া এবং বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সংগঠনের যোগসূত্র স্থাপনে যোগাযোগ (communication) আবশ্যক। ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (Management Information System) এরূপ যোগাযোগের যোগসূত্র স্থাপন করে। যার ফলে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদন সম্ভব হয়।

MIS বা Management Information System বিভিন্ন লেখক কর্তৃক বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। Koontz এর মতে, ‘‘MIS হলো একটি আনুষ্ঠানিক সিস্টেম যা যথাসময়ে ফলপ্রদতা ও দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠানের তথ্য জড়ো, সমন্বিত, তুলনা, বিশ্লেষণ এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাহিরে তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করে।’’ (A formal system together, integrate, compare, analyse and disperse information internal and external to the enterprise in timely, effective and efficient manner)। এরূপ তথ্য প্রবাহ রুটিন মোতাবেক হতে পারে। এভাবে সুষ্ঠু তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

তথ্য অনুশীলনে কম্পিউটারের ব্যবহার

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কৌশল হলো তথ্য অনুশীলন বা বিশ্লেষণে কম্পিউটারের ব্যবহার। কম্পিউটার তথ্য উপাত্ত রক্ষণ (store), তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য পুনরুদ্ধার (retrieve) এবং প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন- মেইনফ্রেম (mainframe) কম্পিউটার, মিনিকম্পিউটার (minicomputer), মাইক্রোকম্পিউটার (micro computer) বা পার্সোনাল কম্পিউটার ইত্যাদি। মেইনফ্রেম কম্পিউটার হলো ফুল স্কেল কম্পিউটার। এ ধরনের কম্পিউটার প্রচুর পরিমাণ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নে সক্ষম। মিনিকম্পিউটার মেইনফ্রেম কম্পিউটারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো এবং মেমোরি (memory) কম। মাইক্রো কম্পিউটার হলো ছোটো ধরনের কম্পিউটার। এটিকে ব্যক্তিক (personal) কম্পিউটারও বলা হয়। এটি ছোটো ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব কম্পিউটার দ্বারা প্রজেক্ট কস্টিং, মজুত নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রয় ইত্যাদি কার্যে সহায়তা পাওয়া যায়। তা ছাড়া প্রাপ্য হিসাব (accounts receivable), প্রদেয় হিসাব (accounts payable), বেতন (pay roll), মূলধন বাজেটিং এবং আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নেও কম্পিউটার সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন- বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কৌশল, সনাতনী অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল, টাইম-ইভেন্ট নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ, প্রোগ্রাম বাজেটিং, কর্মপ্রণালি পরিকল্পনা ও বিবরণ, তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য অনুশীলনে কমপিউটারের ব্যবহার। বাজেটের সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার কার্যসম্পাদন নিয়ন্ত্রণ করাকে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ বলে। অনেকগুলো অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল আছে যেগুলো বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ অবাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো চার প্রকার হতে পারে। যেমন- পরিসংখ্যান উপাত্ত, বিশেষ রিপোর্ট এবং বিশ্লেষণ, কার্যিক অডিট এবং ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ। অন্য একটি পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল হলো সময়-ঘটনা নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ কৌশল। এ কৌশলের মাধ্যমে প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ কীভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পর আন্তঃনির্ভরশীল তা মূল্যায়ন করা হয়। সময়-ঘটনা নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণে সাধারণত তিন ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হয়: গ্যান্ট চার্ট, মাইলস্টোন বাজেটিং এবং পার্ট। একটি বহুল ব্যবহৃত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল হলো প্রোগ্রাম বাজেটিং।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? পরিকল্পন ও নিয়ন্ত্রণ কীভাবে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত? আলোচনা করুন।
২. নিয়ন্ত্রণ কমপক্ষে চারটি উপায়ে প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে। এ চারটি উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় জড়িত পদক্ষেপগুলো আলোচনা করুন।
৪. বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ কী কী? প্রত্যেক প্রকার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপনার ধরণা ব্যক্ত করুন।
৫. কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৬. আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ল্যান নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য নির্দেশ করুন।
৭. প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ, বাছাই নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন-উত্তর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?
৮. বাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কী? বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৯. ফলপ্রদ বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো কী কী?
১০. অবাজেটারি নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলো কী কী? টাইম ইভেন্ট নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ-কার্য সম্পন্ন করা হয়?
১১. তথ্য অনুশীলনে কম্পিউটারের ব্যবহারকে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের অন্যতম কৌশল বলা হয় কেন?